আমাদের নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী

নুরুল আনোয়ার চৌধুরী

ত্রিশ দশকের শেষদিকে, খুব সম্ভবতঃ ১৯৩৭ সালে আমরা কয়জন ছাত্র চট্টগ্রাম কলেজ হোস্টেলে ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে দেখা করতে যাই। তখন তিনি আই-এ'র প্রথম পর্বে ভর্তি হয়েছিল। সাক্ষাতের সময় তৎকালীন ছাত্র নেতা আবুল খায়ের সিদ্দিকী ও হালিশহরের সিকান্দার মিয়া ছিলেন। আলাপ হল, হাসি টাট্টা করলেন, চা খাওয়ালেন। এরপর তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন।

সেখানে করমাইকেল হোস্টেলে থাকতেন। চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে আলীগড়ে সর্বভারতীয় মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিনি এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তখনকার দিনে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশের ছাত্ররাই নেতৃত্ব দিত। সম্মেলনে মাংমুদাবাদের রাজাকে সভাপতি ও তাঁকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে বাঙালিদেরকে ছাত্র নেতৃত্বে বরণ করে নেয়া হয়।

করমাইকেল হোস্টেল ছাত্র সংসদেরও তিনি সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তৎসময়ে একটি রেওয়াজ ছিল যে, হলের বার্ষিক ভোজ সভায় বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত। এতে দেশের একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্বকে প্রধান অতিথি করা হত, তিনি বক্তা হিসাবেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। চৌধুরী সাহেব ভিপি নির্বাচিত হওয়ার পর আয়োজিত বার্ষিক ভোজ সভা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষে কমিউনিজ্যম আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এম, এন রায় প্রধান অতিথি ছিলেন। বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় চৌধুরী সাহেব বিজয়ী হন। ফজলুল কাদের চৌধুরীর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে প্রধান অতিথির ভাষণে এম, এন রায় ভবিষ্যতবাণী করেন যে, চৌধুরী সাহেব ভবিষ্যতে ভারতের নেতৃত্ব দেবেন।

কুখ্যাত হলওয়েল মনুম্যান্ট অপসারণ আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। তাঁরই সভাপতিত্বে গড়ের মাঠে এই মনুম্যান্ট অপসারনের দাবীতে যেই সভা হয় তাতে নেতাজী সুভাষ বসু প্রধান অতিথি ছিলেন। সভার পরপরই এই দুই নেতার নেতৃত্বে জনতা হলওয়েল মনুম্যান্ট ভেঙ্গে ফেলে।

৪১'র ডিসেম্বরে পেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক যখন মুসলিম লীগ ত্যাগ করে শ্যামা প্রসাদ মুখ্যার্জীর সাথে আঁতাতের মাধ্যমে বাংলায় দ্বিতীয়বার মন্ত্রীসভা গঠন করেন তখন মুসলিম লীগের উদ্যোগে শ্যামা হক সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করে। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় ফজলুল কাদের চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। পরবর্তীতে বরিশালের সভায়ও তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং ফরিদপুরে জনসভায় ভাষণ দিয়ে চট্টগ্রামের সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে চাঁদপুর পৌঁছলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

চট্টগ্রামের মুসলিম হলে (জেমিসন মেটারনিটি হাসপাতালের পেছনে অবস্থিত ছিল) অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সভাটি ফজলুল কাদের চৌধুরীর গ্রেফতারের প্রতিবাদ সভায় রূপান্তরিত হয়। এতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন, মওলানা আকরাম খান, মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান, ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেক প্রমুখ বক্তৃতাকালে বলেন-" ব্রিটিশের বন্ধু শ্যামা-হক সরকার ফজলুল কাদের চৌধুরীকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। তোমাদের প্রিয় নেতাকে তোমাদের কাছে উপস্থিত করতে পারলাম না।" এভাবে তিনি চট্টগ্রামবাসীর কাছে একজন সংগ্রামী নেতা হিসাবে পরিচিত হন। প্রকৃতপক্ষে হলওয়েল মনুম্যান্ট অপসারণ ও শ্যামা-হক সরকার পতনের আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে কলকাতাসহ সমগ্র বাংলায় যুবনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ফজলুল কাদের চৌধুরী একজন বলিষ্ঠ নেতা। দক্ষ সংগঠক ও দৃঢ়চেতা প্রশাসক ছিলেন।

৪২'র শেষের দিকে মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উপদেশে চট্টগ্রামে চলে আসেন। এই সময় খান বাহাদুর ফরিদ আহমদ ও সগির আহমদ যথাক্রমে চট্টগ্রাম জিলা মুসলিম লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তারা ছিলেন ধর্ণাঢ্য ব্যক্তিদের প্রতিনিধি। তাই দল ও ধর্ণাঢ্য ব্যক্তিদের ড্রইং রুমেই সীমাবদ্ধ ছিল। সোহরাওয়ার্দী সাহেব শেখ রফিউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকীর কাছে এক চিঠি দিয়ে লিখেন যে, ফজলুল কাদের চৌধুরীকে চট্টগ্রামে পাঠানো হল, তাকে ব্যবহার করতে পারলে দল সজীব হবে। এরকপি মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমার কাছেও দেয়া হয়। তৎকালীন ছাত্র নেতা নজমুল হক চৌধুরী (এয়াছিন নগর/রাউজান), উকিল আফসার আহমদ (ফটিকছড়ি) প্রমুখের কাছেও এর কপি পাঠান। আমরা চিঠি পেয়ে তার সাথে দেখা করতে যাই। এসময় আমাদের সাথে অধ্যাপক মুহাম্মদ খালেদ (সম্পাদক, দৈনিক আজাদী), মোজাম্মেল হক (কাজেম আলী হাই স্কুলের সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষক), মহিশখালীর আলী হোসেন, সফিউল ইসলাম (ম্যাজিস্ট্রেট/পটিয়া) ছিলেন।

প্রথমে তিনি আমাদেরকে পাত্তাই দিতেন না। বিভিন্ন কথায় উচ্চস্বরে হাসতেন। ধরে নিয়েছি যে, তিনি আমাদের পরীক্ষা করছেন। অনেক কষ্টে তাকে মাঠে নামাতে সক্ষম হই। এসময় অবশ্য আবুল খায়ের সিদ্দিকী এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

শেখ রমিউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকীকে সভাপতি ও চৌধুরী সাহেবকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে চট্টগ্রাম জিলা মুসলিম লীগ কমিটি গঠিত হয়। আবুল খায়ের সিদ্দিকী, নজমুল হক ও আফসার আহমদ যুগ্ম সম্পাদক, আলী হোসেন, সফিউল ইসলাম ও আমি সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হই।

ফজলুল কাদের চৌধুরী জিলা মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণের মাঝ দিয়ে সত্তর দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, অসীম সাহসিকতা, সহমর্মীতা, সহিষ্ণুতা ও বলিষ্ঠতার মাঝ দিয়ে একক প্রতিষ্ঠিত নেতা হিসাবে সেই ফেনী নদী হতে টেকনাফ পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছেন। তিনি ধর্ণাঢ্য ব্যক্তিদের ড্রইং রুম হতে মুসলিম লীগকে রাজপথে এনে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। তখন জনসভায় যত লোক আসত তারা শুধু তাঁকে দেখার ও তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনার জন্যই আসত। তিনি যেদিক দিয়ে যেতেন সেদিকে লোকে বলত মুসলিম লীগ এসেছে। এতবড় মাপের সংগঠক আমি দেখিনি। তৎসময়ের মুসলিম যুব সমাজকে তিনিই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন ও মুসলিম জাতীকে কংগ্রেসের চক্রান্তের হাত হতে উদ্ধারের জন্য মুসলিম লীগ পতাকাতলে ঐকবদ্ধ এবং আর্থ-সামাজিকভাবে সচেতনহতে।

তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেননি। ৪৬-র ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগ আহূত Direct Action Day-তে সকাল ১০/১১ টায় দোস্ত বিল্ডিংস্থ দলীয় কার্যালয় হতে ঘোড়ায় চড়ে তিনি এক বিশাল মিছিলের নেতৃত্ব দেন। শহর প্রদক্ষিণ করে বক্সিরহাট মোড়ে এসে ঘোড়ায় বসায় অবস্থায় বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে বলেন, আমাদের প্রতিবাদ দিবসে প্রমাণিত হয়েছে ব্রিটিশের দিন শেষ হয়েছে। আমরা হিন্দু-মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধভাবে এদেশে থাকতে হবে। এসময়ে উপস্থিত জিলা কংগ্রেসের সম্পাদক মহিম দাসের হাত ধরে বলেন-আমরা ঘোষণা করছি যে 'এখানে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক অটুট থাকবে।'

৪৬-র নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগ দলীয় পার্লামেন্টারী গঠনকালে তিনিও একজন সদস্যপ্রার্থী হন। তখন সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে এক গ্রুপ, অপর গ্রুপ খাজা নাজিমুদ্দিন ও মৌলানা আকরাম খানের নেতৃত্বে চলছিল। ফজলুল কাদের চৌধুরী সবসময় সোহরাওয়ার্দী আবুল হাসিম গ্রুপের যুব ফ্রন্টের নেতা ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তাঁর একনিষ্ঠ সহকর্মী। বোর্ডের সদস্য পদ প্রার্থী হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী তাঁকে সহযোগীতা দানে অস্বীকার করায় তিনি খাজা নাজিমুদ্দিনের সমর্থন চেয়েও ব্যর্থ হন। কারণ খাজা গ্রুপ তাঁকে তাঁদের সহযোগী হিসাবে কাজ করার অনুরোধ জানালে তিনি সরাসরি অস্বীকার করে মুখের উপর উত্তর দেন যে, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে আমি বেইমানী করব না। ফলশ্রুতি খাজা গ্রুপ তাঁকে সমর্থন দানে অস্বীকার করে বটে, সাথে সাথে চৌধুরী সাহেবের ক্ষতি করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। খাজা সাহেবের সমর্থন কামনায় তার সাথে দেখা করেছেন খবরটি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করেন। রাজনীতিতে একটি কূটনীতি যে আছে তা চৌধুরী সাহেবকে স্পর্শ করেনি বলে খাজা গ্রুপের চক্রান্তের শিকার হন। যার জন্য ৪৬-র সাধারণ নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে মনোনয়ন পর্যন্ত দেননি। এমনকি প্রার্থী বাঁচাইয়ের জন্য সোহরাওয়ার্দী খাজা নাজিমুদ্দিন চট্টগ্রামে আসার পর মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত সভায় দাবী অনুযায়ী তাঁরা ফজলুল কাদের চৌধুরীকে মনোনয়ন দেবেন বলে ঘোষণাও দিয়েছিলেন। নির্বাচনী অর্থসংগ্রহের জন্য সোহরাওয়ার্দী সাহেব একটি কমলালেবু নিলামে দিলে তা উচ্চমূল্যে চৌধুরী সাহেব ক্রয় করেন।

কলকাতায় দলীয় কার্যালয়ে পার্লামেন্টারী বোর্ড যখন চৌধুরীর স্থলে খান বাহাদুর ফরিদ আহমদকে দলীয় মনোনয়ন দেয়ার কথা ঘোষণা করে তখন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এক বিরাট যুব ও ছাত্র সমাজ তীব্র প্রতিবাদ করি, কার্যালয়ের দরজা-জানালা পর্যন্ত ভাঙ্গচুর করি। পরে তিনি শেখ মুজিবর রহমান ও আমাদেরকে ডেকে বল্লেন-আমার কাছে মনোনয়নের চেয়ে দল বড়। অতএব যাকে মনোনয়ন দিয়েছে তাকে বিজয়ী করাই আমার মহান দায়িত্ব।

একমাত্র ৫৪-র নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে প্রার্থী হওয়া ব্যতীত তাঁর দীর্ঘ প্রায় চার দশকের রাজনৈতিক জীবনে তিনি দলীয় সিদ্ধান্ত ও আদর্শে অটুট ছিলেন। তাঁর কাছে দলীয় স্বার্থ ছিল স্বীয় স্বার্থের অনেক অনেক উর্দ্ধে। যা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত বিরল।

চৌধুরী সাহেবকে কোন প্রকারের অর্থ লোভে কখনও বিভ্রান্ত করতে পারেনি। তেমনি তিনি কর্মীদেরকেও অর্থমোহে নীতিচ্যুত না হওয়ার জন্য উপদেশ দেন।

শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি বা মানুষ উন্নতি লাভ করতে পারে না বলে তিনি ক্ষমতার ভিতর ও বাহিরে থেকে শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুব ও ছাত্র সমাজকে জ্ঞান অর্জনের উপর গুরুত্ব দিতেন, উৎসাহিত করতেন। তাই দেখি সরকারের সকল নিয়মনীতি উপেক্ষা করে চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউশন, মেরিন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছেন। জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও শিক্ষা মন্ত্রী থাকাকালে চট্টগ্রামের এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা নাই যেখানে তিনি সাহায্য দেননি।

স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি কখনও দ্বিমত পোষণ করেন নি। পাকিস্তানের কাঠামোতে যে আঞ্চলিক বৈষম্যতা ছিল তা দূরীকরণের জন্য চৌধুরী সাহেবই একমাত্র বাঙালি মন্ত্রী যিনি তাঁর অধীনস্থ মন্ত্রণালয়সমূহে কোন বাঙালিকে চাকুরীচ্যুত না করার, নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে বাঙালিদের নিয়োগদান ও প্রাধান্য দেয়ার এবং নূন্যতম ৫০/৫০ ভাগ অর্থাৎ বাঙালি ৫০ ও অবাঙালি ৫০ ভাগ কোটা নির্ধারণ করে নির্দেশনামা দিয়েছিলেন। যার ফলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাথে তাঁর সংঘাত হয়েছে বহুবার।

চৌধুরী সাহেব বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে পাওনা আদায় করে স্বাধীনতা পথে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। মূলত পথ ও মত ভিন্ন হলেও স্বাধীনতার প্রশ্নে শেখ সাহেবের সাথে তাঁর কোন দ্বিমত ছিল না। '৭১-র অক্টোবরে করাচীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে সভাপতির ভাষণে চৌধুরী সাহেব অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়ে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের জোর দাবী জানান। তিনি এটাকেই একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন।

চৌধুরী সাহেবের একটি মহৎ গুণ আমি লক্ষ্য করেছি। তা হল চট্টগ্রামবাসী, তাঁর কর্মী ও অনুরাগীদেরকে হৃদয় উজাড় করে ভালবাসতেন, বিশ্বাস করতেন। তিনি ক্ষমতার শীর্ষে গিয়েও জনতার কাছে থাকতে পছন্দ করতেন। তাই যতবারই পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ততবারই চট্টগ্রামে ছুটে আসতেন। চট্টগ্রামের মানুষ তখন তাঁকে কাছে পেয়ে হৃদয় দিয়ে অনুভব করত আর গভীরভাবে বিশ্বাস করত যে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা তাদেরকে ভুলে যাননি, ভুলতে পারে না। এটাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিরাট সফলতা। তাঁর মৃত্যুকে নিয়ে যেই রহস্যের জন্ম হয়েছে তা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। শেখ মুজিবুর রহমানের অগোচরে একটি বিশেষ চক্র তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে, একথা কিন্তু আমার একার নয়। সমগ্র চট্টগ্রামবাসী ও এ কথা বিশ্বাস করে।

দলীয় আদর্শে চৌধুরী সাহেব এক বিরল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। সময়ের স্রোতে স্বীয় স্বার্থে তিনি আদর্শকে বিসর্জন দেননি। মনে হয় সময়োপযোগী মত পরিবর্তন না করাটাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ট্র্যাজেডী বা ব্যর্থতা। নতুবা তিনি ব্যর্থতাহীন এক সফল রাজনীতিক।

জানি না তাঁর মত চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পন্ন, আদর্শবান ও বলিষ্ঠ নেতা আর কখনও জন্ম নেবেকিনা।